জলবায়ুর বিপদ

বাঁচার উপায়

BMZ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

DRCSC

Partnershop Development Justice

NETZ বাংলাদেশ

জলবায়ুর বিপদ

আঁচার উপায়

প্রকাশকাল এপ্রিল, ২০২২
ডিআরসিএসসি

সঞ্চয়ন ও বিন্যাস
অর্ধেন্দু শেখর চ্যাটার্জি, তাপস মণ্ডল, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা ও পাঠ–সংশোধন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ
অভিজিত দাস

হরফ
শিপ্রা দাস

রূপ
অভিজিত দাস

আলোকচিত্র
ডি আর সি এস সি সংগ্রহ, ইন্টারনেট

অর্থ–সহযোগ

BMZ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Partnership Development Justice NETZ বাংলাদেশ

মুদ্রক ও প্রকাশক
দিলীপ সরকার
ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার
৫৮এ ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২

ভূমিকা

জলবায়ু বদলে যচ্ছে। ঠান্ডা-গরম, বৃষ্টি বাদল, ছয় ঋতুর হেরফের হচ্ছে। এর ফলে চাষবাস খারাপ হবে, রোজগার ভালো হবে না, পেটে টান পড়বে।

তাহলে কী করব? বাঁচব কীভাবে? এই সমস্ত কথাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনাদের এই কথাগুলো কাজে লাগলে তবেই ভালো।

দিলীপ সরকার
সম্পাদক
ডিআরসিএসসি
মে ২০২২

জলবায়ু বদল বলে একটা কথা চারপাশে বেশ শোনা যাচ্ছে। সবাই বলছে এর ফলে নাকি গ্রাম-শহর তলিয়ে যাবে, চাষবাস খারাপ হবে, গরম বাড়বে, বন্যা হবে ইত্যাদি। আবার এর থেকেই নাকি খাবারের অভাব হবে, রোগভোগ বাড়বে, অযথা প্রাণহানি হবে। সব মিলিয়ে আমাদের খুব বিপদ হবে।

কিন্তু জলবায়ু বদল মানে কী? কই চারপাশে ঠান্ডা-গরম, বৃষ্টি-বাদল সবইতো একইরকম আছে? একটু আধটু হেরফের হয়তো হচ্ছে, কিন্তু তাই দেখেই কি জলবায়ু বদলে যাচ্ছে বলা যায়?

কথাগুলোর ভেতর খুব একটা ভুল নেই। সাদা চোখে দেখলে প্রকৃতি-পরিবেশের খুব একটা রদবদল সত্যিই আমাদের চোখে ধরা দেবে না। কিন্তু জলবায়ু বদলাচ্ছে। এই বদলটা হচ্ছে খুব আস্তে আস্তে। তাপমাত্রা অল্প অল্প করে বাড়ছে, গরম বাড়ছে অল্প অল্প করে। দেখা যাবে দশ বছরে বরফ গলবে হয়তো আধ ইঞ্চি। কিন্তু আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে হতে একদিন বড় ফাটল দেখা দেবে। দেখা দেবে সর্বনাশ। ঘটনাটা ঘটছে অনেকটা গোপনে সিঁধকাটার মতো করে। ইংরেজিতে বললে বলা হবে স্লো পয়জনিং।

তবে এই কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, জলবায়ুর এই বদল আগে কখনো হয়নি। পৃথিবীতে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। যেমন, ক্ষুদ্র বরফ যুগে পৃথিবীর জলবায়ুর এমন বদল হয়েছিল, পৃথিবী এমন

ঠান্ডা হয়েছিল যে পৃথিবী জুড়ে রোগ-মহামারি-দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। আবার তার আগে মধ্য-উষ্ণযুগে গরম বেড়েছিল বেশ। পৃথিবীর জন্ম মোটামুটি সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে। জন্মের পর থেকে পৃথিবীর প্রকৃতির যেমন যেমন বদল হয়েছে, পৃথিবীর জলবায়ুরও বদল হয়েছে সেইভাবেই।

তাহলে আগেও যদি এরকম হয়ে থাকে, তবে এবারের জলবায়ু বদল নিয়ে আমরা এত ভাবছি কেন? কেন মনে হচ্ছে যে জলবায়ুর বদল যেন পৃথিবীতে এইবার প্রথম হল? এরকম করে ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। আসলে এইবারের বদলের জন্য বেশি দায়ী নাকি আমরা নিজেরা। মানুষের বেহিসেবি কাজকর্ম এবারের জলবায়ু বদলকে দ্রুত ঘটাচ্ছে। মানুষকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনই নাকি বিজ্ঞানীরা

বলছেন। তবে আগের বদলগুলোয় প্রকৃতির ভূমিকা বোঝা গেলেও, মানুষের কতটা দায় ছিল তা স্পষ্ট করে জানা যায় না।

তবে এগুলো আমরা সবাই হবে ভাবছি। সবই যে হবে এমন নাও হতে পারে। আবার যা হবে ভাবছি তার চেয়ে খারাপও ঘটতে পারে। তবে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা থাকছেই।

কিন্তু জলবায়ু বদল মানে ঠিক কী?

মরশুমের পরিবর্তন নিয়ম মেনে না হলে, তার কোনো হেরফের হলে, সেই নিয়মের হেরফেরকে জলবায়ু বদল বলে। বিষয়টাকে একটু বড়সড় করে বলি। আসলে আমাদের বাতাসে নানা ধরনের গ্যাস আছে, বা বলতে পারি নানা ধরনের গ্যাসীয় উপাদান আছে। সংখ্যায় যা ১২টার বেশি। এই ১২টার মধ্যে মূলত পাঁচটা গ্যাস আছে, যেগুলো পৃথিবী যে তাপ ছাড়ে তার অনেকটা ধরে রাখতে পারে। এই গ্যাস পাঁচটা হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও ওজোন। সূর্য থেকে আলো ও তাপশক্তি পৃথিবীতে এসে

পড়ে, পৃথিবী থেকে তাপশক্তি আবার মহাকাশে ফেরত যায়। এই ফেরত যাওয়ার সময় বাতাসের এই পাঁচটা গ্যাস পৃথিবী থেকে ফেরা এই তাপশক্তির অনেকটা ধরে রাখে। এর ফলে পৃথিবী যেটুক গরম থাকার কথা গরম থাকে, পৃথিবীর জীবজগতের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই তাপমাত্রার হেরফের হলে পৃথিবীতে কী হত বলা যায় না। খারাপ হত না ভালো হত বোঝা যায় না।

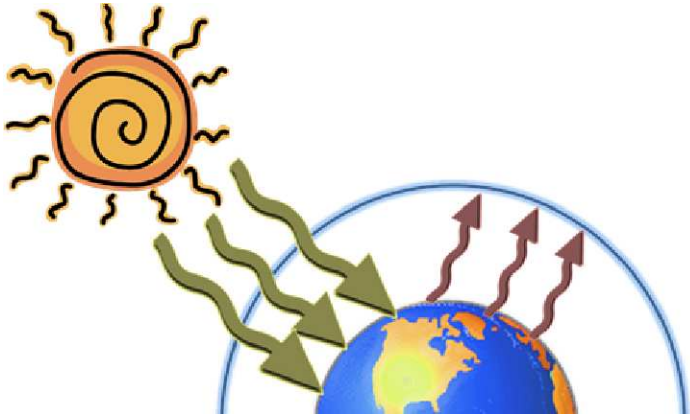

এই গ্যাসের তাপ ধরে রাখার ও জীবজগতে তার প্রভাবের একটা ইংরেজি নাম আছে। নামটা হল গ্রিন হাউস এফেক্ট। শীতের দেশে গাছপালা কাচের ঘরে রাখা হয়, গাছপালাকে ঠিকঠাক তাপমাত্রায় বড় করার জন্য। ইংরেজি নামটা শীতের দেশের এই গাছপালার ঘর থেকেই এসেছে।

যাই হোক না কেন, এখন বলা হচ্ছে এই গ্যাসগুলোর ভেতর বেশ কয়েকটা গ্যাসের বায়ুমণ্ডলে পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, পরিমাণে বেড়ে যাওয়ার ফলে এইসব গ্যাস বেশি তাপ ধরে রাখছে। ফলে পৃথিবীর গরম

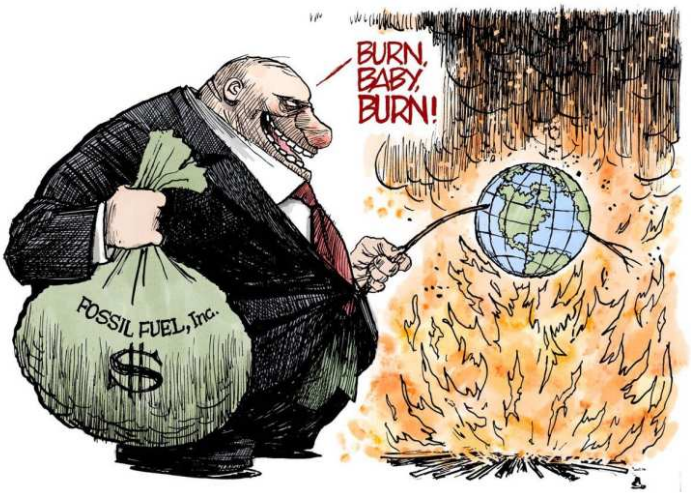

হওয়ার মাত্রাও বেশ বাড়ছে। তবে এর ভেতর নাকি কার্বন-ডাই-অক্সাইড-ই বাড়ছে বেশি। তারপর আছে নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেন।

এবার জলবায়ু বদল নিয়ে একটু অন্য কথা বলি। এই গ্যাসগুলো যে পৃথিবীতে বাড়ছে ও বাড়ার ফলে আমাদের যে খারাপ হচ্ছে, এই নিয়ে অনেকদিন থেকে বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা করছিলেন। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছিল। শেষ অব্দি,এক আন্তর্জাতিক সমিতি তৈরি হল। যে সমিতি ওই পরীক্ষার ফলগুলিকে এক জায়গায় করে জলবায়ু বদলের গতিবিধি পাকাপাকিভাবে জানবে।

এই সমিতির নাম ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডাক নাম আইপিসিসি। বাংলায় বললে দাঁড়ায়, জলবায়ু বদল তদারকির আন্তঃসরকারি সমিতি। তৈরি হল ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে। সমিতিটি বানাল রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'পরিবেশ উদ্যোগ' ও বিশ্ব আবহাওয়া সঙ্ঘ মিলে।

আগে যেমন বলছিলাম সেই কথায় ফিরি। বলছিলাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এই বৃদ্ধি মাপা শুরু হয় ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৮ থেকে হিসেব করে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর এই গ্যাস বাড়ছে ২১ শতাংশ হারে। বাকি তিনটি গ্যাসও বাড়ছে, তবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় যা তেমন বেশি নয় বলা হচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড আমরা বাড়াচ্ছি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে, গাড়ি চালিয়ে, সিমেন্ট ইত্যাদি কয়েকটি শিল্প থেকে। নাইট্রাস অক্সাইড বাড়াচ্ছি চাষে পশুর বর্জ্য থেকে, মিথেন বাড়ছে ধানজমিতে জল জমে।

তবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে,এই গ্যাসগুলি খালি আমরা মানে, মানুষরাই বাড়াচ্ছি। প্রকৃতি থেকেও এই গ্যাসগুলি বায়ুমণ্ডলে মিশছে। তবে পরিমাপের বিচারে মানুষের জন্য হয়তো এই পরিমাণ বেশি বেশি করে বাড়ছে।

যেমন প্রকৃতি থেকে কার্বন-ডাই- অক্সাইড যাচ্ছে আগ্নেয়গিরি, দাবানল ও আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস থেকে, নাইট্রাস অক্সাইড যাচ্ছে মাটি ও জলের ব্যাকটেরিয়া থেকে। আর মিথেন হিমবাহ, জলাভূমি, দাবানল ইত্যাদি থেকে। এইভাবে এক ভয়াল অবস্থা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু বদলালে কী হতে পারে।

জলবায়ু বদলালে সাধারণত কী হচ্ছে-কী হবে

- গরম বাড়ার ফলে জমে থাকা বরফ গলে যাচ্ছে, ফলে সাগরের জল বেড়ে যাচ্ছে।
- গরম বাড়ার ফলে নদীনালা, সমুদ্রের জল সূর্য বেশি বেশি করে শুষে নিচ্ছে। ফলে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি সব ভাসিয়ে নিচ্ছে।
- গরম বাড়ার ফলে গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। কোনো গাছপালা ঠিকমতো বাড়ছে না।
- শীতের দেশের পশুপাখি ও সমুদ্রের জীবজগতের থাকার জায়গা পাল্টে যাচ্ছে।
- খাবার কমতে পারে, বন্যা বাড়তে পারে, প্রকৃতিতে আরো নানা রদবদল ঘটতে পারে।

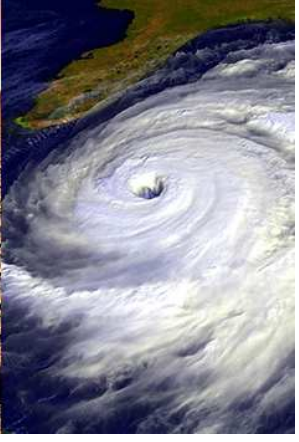

জলবায়ু বদল মোকাবিলা

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সুস্থায়ী চাষ

জলবায়ু বদল কমিয়ে নিয়ে আসার লক্ষ্য ও তার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি ঃ

- **মিথেন কমানো**
- গোবর ও অন্যান্য পশুপাখির মলমূত্র ইত্যাদি মুক্তস্থানে ফেলে না রেখে বা নষ্ট হতে না দিয়ে বায়োগ্যাসে ব্যবহার, জৈবদ্রবণ, কেঁচো সার তৈরি ইত্যাদিতে ব্যবহার।

- স্থানীয় জাতের ছোট ছোট গৃহপালিত প্রাণী যারা একই ধরনের খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত তার সংখ্যা না বাড়িয়ে, ভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রাণীপালন। যেমন হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া, শূকর, খরগোশ ইত্যাদি।

- যে কোনো ধরনের প্লাস্টিক-সিন্থেটিক এবং নাইট্রোজেন যুক্ত সারের ব্যবহার না করা। পরিবর্তে জৈবসার, বায়োগ্যাসের স্লারি বা অবশেষ, খোল, সবুজসারের ব্যবহার বাড়ানো।

- চাষ লাঙল দেওয়ার বদলে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার কমানো, অল্প লাঙল অথবা বিনা লাঙলে চাষ শেখানো।

- ডিজেল পাম্প না চালিয়ে, প্যাডেল পাম্প ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণে উৎসাহ দেওয়া।

- মাটির নীচের জলের ব্যবহার কমানো, বৃষ্টির জলের ব্যবহার বাড়ানো।

- কৃষি-বর্জ্য খোলা জায়গায় না জ্বালানো, তাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ে।

- সৌরশক্তির ব্যবহার। সৌরলণ্ঠন, সোলার কুকার ব্যবহার।

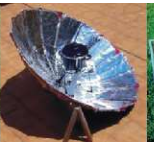

- বিভিন্ন ধরনের উন্নত চুলা ব্যবহার, যেখানে কম কাঠে বেশি তাপ পাওয়া যায়। যেমন ধোঁয়াহীন চুলা।

- আপৎকালীন সময়ের জন্য মূল ও কন্দ জাতীয় ফসল সংরক্ষণ করে রাখা। বিভিন্ন জাতের ওল, কচু, খামালু জাতীয় ফসলগুলোর চাষ বাড়ানো।

- দল বা গোষ্ঠীভিত্তিক শস্য ভাণ্ডার এবং বীজ ভাণ্ডার তৈরি।

- নদীর পাড়ে, রাস্তার ধারে গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত বহুমুখী বন তৈরি। যেখান থেকে সারা বছর স্থানীয় ফল, খাদ্য, গোখাদ্য, জ্বালানি পাওয়া যাবে ও নদীর বাঁধ রক্ষায় কাজে লাগবে।

- বিভিন্ন পশু + পাখি + মাছ + সবজি ইত্যাদি মিলিয়ে উৎপাদন, যার থেকে অভাবের সময় কিছুটা আয় করা যেতে পারে।

- স্থানীয় খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি জানা ও শেখা। যথাযথ কারিগরি ব্যবহার করে পদ্ধতিগুলোকে আরও উন্নত করা। আলু, বাঁধাকপি, টমেটো, লংকা, লেবু, কচু ইত্যাদি এইসব পদ্ধতির মাধ্যমে বেশিদিন রাখা যায়।

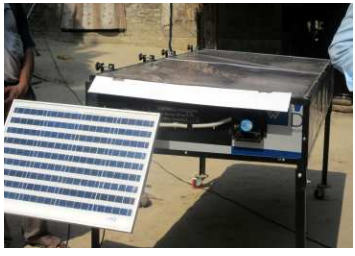

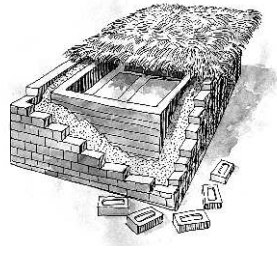

- দল বা গোষ্ঠীভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ ও লেবেলিং-প্যাকেজিং ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য উৎসাহিত করা। যেমন, যৌথ উদ্যোগে কেঁচোসার তৈরি ইত্যাদি।

- স্থানীয় হস্তশিল্পকে খুঁজে বার করা এবং সেগুলি দিয়ে ছোট ছোট প্রকল্প বা ব্যবসার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজারের সুবিধে তৈরি। যেমন দুধের সর চাল, গোবিন্দভোগ চাল, মরিচশাল চাল ইত্যাদি দ্রব্যের বাজার করা।

জলবায়ু - প্রভাব মানিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম

- বিভিন্ন সময়সীমার ফসল একসাথে চাষ করা, মূলত প্রতিকূলতা সহ্যকারী ফসল বাছা, বেশি করে মিশ্রচাষ করা।

- বেশিদিন বাঁচে এরকম কিছু ফসল এবং গাছের চাষ বাড়ানো। যা অসময়ে বৃষ্টিপাত ও কম বৃষ্টিপাতে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যেমন আম, সজনে, আতা, নোনা, জাম, আমড়া, লেবু, করমচা ইত্যাদি।

- পুকুরের পাঁক-পলি ইত্যাদি মাটিতে যোগ করে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো।

- MGNREGS-এর সাহায্যে চাষের উপযোগী পুকুর খোঁড়ার কাজে সাহায্য করা এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণ।

- ২০ বছরের বৃষ্টিপাতের তথ্য স্থানীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা, ওই তথ্যে বেশি বৃষ্টিপাতের মাসগুলিকে চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় চাষির সঙ্গে কথা বলে নতুন করে ফসল লাগানোর ক্যালেন্ডার তৈরি করা।

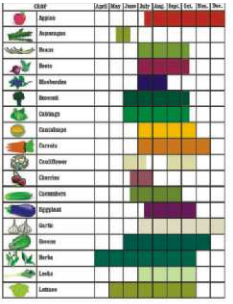

- মাটির উর্বরতা ধরে রাখার জন্য আচ্ছাদন ব্যবহার করা।

- স্থানীয় জাতের বীজ সঞ্চয়। প্রতিকূলতা সহ্যকারী ফসল চাষে এবং যে সমস্ত চাষি বীজ রাখে তাদের দল তৈরিতে উৎসাহিত করা।
- বীজ ধরে রাখা ও সঞ্চয় করার ক্যালেন্ডার তৈরি। দল ভিত্তিক সবজি নার্সারি তৈরিতে উৎসাহিত করা।

জলবায়ু-প্রভাব কমাতে আরো যে বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার

- আলো ও পাখা ঠিক সময়ে বন্ধ করা।
- জলের যথাযথ ব্যবহার অথবা জল নষ্ট না করা।
- সাদা কাগজের যথাযথ ব্যবহার করা, প্ল্যাস্টিক ব্যবহার না করা।
- স্থানীয় মরশুমি শাকসবজি, মাছ, ফল খাওয়ার প্রবণতা বাড়ানো। হিমঘরে রাখা সবজি এবং প্যাকেজিং ফুডের উপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- একই জিনিসের পুর্নব্যবহার করা।

- রান্নাঘরের অব্যবহৃত দ্রব্য, সবজির খোসা এবং অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে কম্পোস্ট এবং টবে বা বারান্দায় গাছ লাগানোর অভ্যাস তৈরি।

- আপৎকালীন সময়ের জন্য মূল ও কন্দ জাতীয় ফসল সংরক্ষণ করে রাখা। বিভিন্ন জাতের ওল, কচু, খামালু জাতীয় ফসলগুলোর চাষ বাড়ানো।

- দল বা গোষ্ঠীভিত্তিক শস্য ভাণ্ডার এবং বীজ ভাণ্ডার তৈরি।

- নদীর পাড়ে, রাস্তার ধারে গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত বহুমুখী বন তৈরি। যেখান থেকে সারা বছর স্থানীয় ফল, খাদ্য, গোখাদ্য, জ্বালানি পাওয়া যাবে।

- বিভিন্ন পশু+পাখি+মাছ+ সবজি ইত্যাদি মিলিয়ে উৎপাদন, যার থেকে অভাবের সময় কিছুটা আয় করা যেতে পারে।

- স্থানীয় খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি জানা ও শেখা। যথাযথ কারিগরি ব্যবহার করে পদ্ধতিগুলোকে আরও উন্নত করা। আলু, বাঁধাকপি, টমেটো, লংকা, লেবু, কচু ইত্যাদি এইসব পদ্ধতির মাধ্যমে বেশিদিন রাখা যায়।

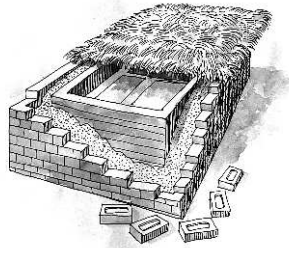

- দল বা গোষ্ঠীভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ ও লেবেলিং-প্যাকেজিং ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য উৎসাহিত করা। যেমন, যৌথ উদ্যোগে কেঁচোসার তৈরি ইত্যাদি।

- স্থানীয় হস্তশিল্পকে খুঁজে বার করা এবং সেগুলি দিয়ে ছোট ছোট প্রকল্প বা ব্যবসার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজারের সুবিধে তৈরি। যেমন দুধেরসর চাল, গোবিন্দভোগ চাল, মরিচশাল চাল ইত্যাদি দ্রব্যের বাজার করা।

এবার এখানে বিকল্প শক্তি, নবীকরণ শক্তি, জ্বালানির কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। এই সব ব্যবস্থায় গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন প্রায় নেই. খনিজ জ্বালানির ব্যবহার নেই, খরচও কম। যার ভেতর আছে বায়োগ্যাস, সোলার বক্স, তুষ-এর ব্যবহার। এগুলো কী ভাবে বসাব ও ব্যবহার করব তার কথাই এবার একে একে আলোচনা করব।

বিকল্প শক্তি ও তার ব্যবহার

জলবায়ু বদলের হার কমিয়ে আনতে বিকল্প শক্তির ব্যবহার একটা বড় উপায় হতে পারে। উষ্ণায়নের ফলে বহু মানুষের জীবন-জীবিকা সবই বিপন্ন। আমাদের কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন,পরিবহন ব্যবস্থায় জ্বালানি বা শক্তির উৎস হিসেবে খনিজ তেল, পাথুরে কয়লা ও মাটির নীচের প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর আরও বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এগুলি তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। এদের ভাণ্ডারও সীমিত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এবার জোগানে টান পড়বে। তাছাড়া এই জ্বালানি আমরা যত বেশি ব্যবহার করব তত বায়ু দূষণ বাড়বে, পৃথিবীর জল ও বাতাস তপ্ত হয়ে উঠবে, মেরু অঞ্চল বাড়বে আর উঁচু পাহাড়ের বরফ/হিমবাহ দ্রুতবেগে গলতে শুরু করবে, এই বলেও তাঁরা সতর্ক করে দিয়েছেন।

তাই নবীকরণযোগ্য শক্তি, যেমন কাঠ ও কাঠকয়লা, কৃষিজ আবর্জনা, পশুপাখির বিষ্ঠা ও সেগুলি থেকে তৈরি বায়োগ্যাস ইত্যাদি বিকল্প সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েই চলেছে। আর প্রবহমান শক্তি, যেগুলির প্রায় অফুরন্ত ভাণ্ডার যেমন বায়ু, জল, সূর্যের আলো ও তাপ, তারও আরো বেশি ব্যবহার দরকার।

গ্রামে ও শহরে জ্বালানির প্রয়োজন কিন্তু ক্রমশই বাড়ছে। একদিকে যেমন আরও বেশি বিদ্যুৎ, আরও দ্রুত পরিবহন, আরও উৎপাদনশীল কৃষি-ব্যবস্থা আমরা চাই, আর এক দিকে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মোনোক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন ও সালফার ডাই-অক্সাইডের নানা রকমের, নানা কিছুর পরিমাণ না কমালেই নয়।

তাই আজকের দিনে এমন জ্বালানির সন্ধান জোর কদমে চলছে, যেগুলি সহজে ফুরোবে না ও যেগুলিকে ব্যবহার করলে বা জ্বালালে বায়ুদূষণ ও উষ্ণায়নের ঝুঁকি কম হবে বা তার মোকাবিলা করা যাবে।

এখানে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে নানা জৈব শক্তির বা জ্বালানির কী কী ব্যবহার করতে পারি তারই উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রামে কী কী বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে সে নিয়েও সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

শক্তির ব্যবহার

কয়লা: ভারতের শক্তির একটি প্রধান উৎস-পৃথিবীতে যা পাথুরে কয়লা আছে তার শতকরা ৭ ভাগ বা প্রায় ৬৪৭,৮৬০,০০,০০০ টন আছে ভারতে। এই ভাণ্ডার ব্যবহারে বিশ্বে আমাদের তৃতীয় স্থান। আরো একশো বছরের মতো ভাণ্ডার আমাদের আছে।

খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস

পৃথিবীর ভাণ্ডারের ০-৭ [১২০১,০০০,০০০মে] ও ০-৮% আমাদের কাছে। সারা দেশে যতটা ব্যবহৃত হয় তার ৭৫% আসে আমদানি থেকে, ২০৩০ সালে যা বেড়ে ৯০% হতে পারে।

নবীকরণযোগ্য শক্তি

ভারত নবীকরণযোগ্য শক্তি চাহিদার প্রায় ১২% পূরণ করতে পারে। এখন এই শক্তির ব্যবহার প্রতি বছর প্রায় ১৮% গতিতে বাড়ছে এবং ২০৫০ সাল পর্যন্ত চাহিদার প্রায় অর্ধেক পূরণ করতে পারবে বলে প্রযুক্তিবিদদের বিশ্বাস।

নানা বিকল্প শক্তি, ব্যবহার

সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ

বছরে আমরা ২৫০-৩০০ দিন অন্তত ৮-৯ ঘণ্টা সূর্যের আলো ভালো করে পেয়ে থাকি। প্রতিদিন প্রতি বর্গমিটার প্রতি ঘণ্টায়, ৪ থেকে ৭ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া সম্ভব। তাই বিজ্ঞানীদের মত, ভারতের এর থেকে ভালো বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব।

যদি কয়লা বা তেল না পুড়িয়ে, সূর্যের আলো দিয়ে মাত্র এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎও হয়, তার ফলে বায়ুমণ্ডল থেকে প্রতি বছর ৩৭৬ কেজি পর্যন্ত নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগ, ৬৮০ কেজি পর্যন্ত সালফার-ডাই-অক্সাইড ও প্রায় ৯৮,৪২৯ কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমানো সম্ভব।

জ্বালানি	পোড়ালে কতটা শক্তি	কত ভাগ ভালো ভাবে পোড়ে
গোবর	২.৫ কিলোওয়াট/ঘণ্টা/কিলো	১২ শতাংশ
কাঠ	৫ কিলোওয়াট /ঘণ্টা/কিলো	১২ শতাংশ
কয়লা	৯.০ কিলোওয়াট/ঘণ্টা/কিলো	২৫ শতাংশ
বায়োগ্যাস	৬.০ কিলোওয়াট/ঘণ্টা/ঘনমিটার	৫৫ শতাংশ

এর থেকে বোঝা যায়, কেন গোবর গ্যাস তুলনায় ভালো ও উপযোগী।

কাঠকুটো,ফসলের বাড়তি অংশ, পশুপাখির মলমূত্র ইত্যাদি সাধারণভাবে বহুকাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। খনিজ জ্বালানি থেকে তৈরি বিদ্যুতের ব্যবহার মাত্র গত কয়েকশো বছরের কথা।

কিন্তু খোলা হাওয়ায় জ্বালালে এর অনেকটা শক্তিই নষ্ট হয়, আর প্রচুর ধোঁয়া বের হয়। এই ধোঁয়ার থেকে শ্বাস, ফুসফুসের নানান রোগ হয়।

ফসলের বাড়তি ও পশুপাখির মলমূত্র ক্ষেতের সার হিসেবে ফিরিয়ে দিতে পারলে মাটি অনেক বেশি উর্বর হতে পারে। তাই জৈববস্তু খোলা উনুনে বা অকারণে জ্বালিয়ে নষ্ট করা কমানো দরকার। এক্ষেত্রে বায়োগ্যাস একটি অতি প্রয়োজনীয় বিকল্প। বাড়ির বেশিরভাগ মল-মূত্র ও সবুজ আগাছা (যেমন, কুচো করে কাটা কচুরিপানা) কে গ্যাস তৈরির কাজে লাগানো যেতে পারে। এই গ্যাস দিয়ে রান্নার কাজ করলে জ্বালানি জোগাড়ের সময় ও খরচ অনেকটাই বাঁচে এবং এর বাড়তি গ্যাস আলো, বিদ্যুৎ উৎপাদন বা জলের পাম্প চালানোর কাজেও

বায়োগ্যাসের রেখাচিত্র

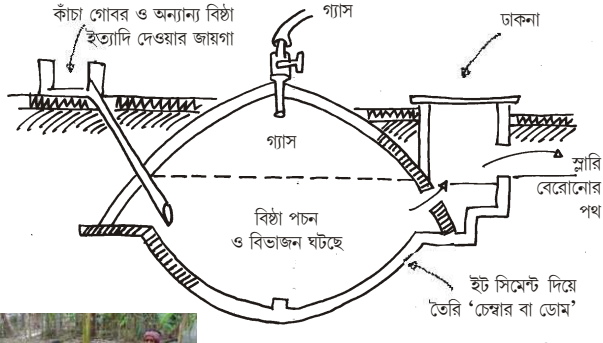

লাগানো যেতে পারে। একটি ৩ ঘনমিটার-এর 'বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট' দিনে ৮-১০ কিলোগ্রাম জ্বালানি কাঠ বাঁচাতে পারে। এছাড়াও এর থেকে প্রতিদিন ৩৫-৩৬ লিটার 'স্লারি' নির্গত হয়, যাকে দিন দশ বারো একটি মাটির গর্তে বা চৌবাচ্চায় শুকিয়ে নিয়ে ক্ষেত বা বাগানের সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। (ধানক্ষেতে কাঁচা তরল সার সেচের জলের সাথে মিশিয়ে পাঠানো সম্ভব) প্রায় ৫-৬ একর জমির, সারা বছরের সার এখান থেকে তৈরি হতে পারে। এতে শুধু সারেরই কাজ হয় না, মাটির গড়নও ভালো হয় এবং মাটির

জলধারণ ক্ষমতাও বাড়ে। মাটির রোগ জীবাণু, যা বিশেষ করে টমেটো, বেগুন ও লংকা এইসব সবজিতে কুঠে রোগ সৃষ্টি করে, স্লারি তারও সমস্যা অনেক কমিয়ে আনে। স্লারিতে কুচো করা কচুরিপানা, খড়কুটো বা শুঁটি জাতের আগাছা ও ঝোপঝাড়ের কুচানো ডালপালা মিশিয়ে, কেঁচোসার তৈরি করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়। বড় 'বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে কচুরিপানা, রান্না বাদে অন্য তেলের খোল (যেমন রেড়ি, করঞ্জ, মহুয়া, বাগ-ভেরেন্ডা ইত্যাদি) গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন 'বায়োগ্যাস চেম্বার'-এর ভেতর দেওয়া যেতে পারে। এতে গ্যাসও বেশি তৈরি হবে, আর সারও হবে আরও উন্নত মানের। পুকুরে মাছের খাবার হিসেবেও আধ শুকনো স্লারি ব্যবহার করা যেতে পারে। ১০০ বর্গমিটার এর পুকুরে তাজা স্লারি সপ্তাহে ১৮-২০ লিটার, আধ-শুকনো স্লারি ৯-১০ লিটার অথবা স্লারি দিয়ে তৈরি কেঁচোসার ৪.৫ থেকে ৫ কেজি প্রতি সপ্তাহে মেশানো যেতে পারে।

কয়েকটি গৃহপালিত পশুর মলমূত্র ও 'বায়োগ্যাস স্লারির' সারে গাছপালা, শাক সবজি বা শস্যের প্রয়োজনীয় প্রধান খাদ্য NPK এর গড় পরিমাণ দেওয়া হল।

	N_2%	P_2O5%	K_2O%
গরুর কাঁচা গোবর	০.৩-০.৪	০.১-০.২	০.১-০.৩
শুকনো গোবর	১.০-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৫
গরুর চোনা	০.৯-১.২	সামান্য	০.৫-০.৯
ছাগল-ভেড়ার নাদি (শুকনো)	২.০-৩.০	১.০-২.৫	২.০-৩.০
মুরগির বিষ্ঠা (তাজা)	১.৫-১.৬	০.৫-০.৮	০.৭৫-০.৮৫
পোলট্রি সার (মুরগি) শুকনো	২.৫-৩.১	২.৬৩	১.৪-১.৫
খরগোশের নাদি (শুকনো)	২.১-২.৩	১.৪-১.৫	০.৮-০.৯
রেড়ির খোল	৪.০-৪.৩	১.৮	১.৩
করঞ্জ খোল	৩.৮-৩.৯	০.৯	১.২
মহুয়া খোল	২.৩-২.৫	০.৮	১.২
গোবর পচানো গাদাসার	১.৪-১.৫	১.০-১.৫	০.৮-১.২
গোবর গ্যাসের স্লারি (ভেজা)	০.২৫	০.১৩	০.১২
গোবর গ্যাসের স্লারি (আধ-শুকনো)	৩.৬	১.৮	০.৬
গোবর গ্যাসের স্লারি (শুকনো)	১.৫-২.২	১.৪-২.০	০.৯-১.২
মুরগির বিষ্ঠার স্লারি	২.৫-২.৭	২.২-০.৮	০.৭-০.৯

দেখতে পাচ্ছি, বায়োগ্যাসের স্লারির মান পশুপাখির বিষ্ঠা থেকে উন্নত, বিশেষত তা যদি আধ শুকনো অবস্থায় ব্যবহার করা যায়।

বলা যেতে পারে, বায়োগ্যাসের প্রচলন আরও বেশি হলে মহিলা ও শিশুদের বেশ কিছু সময় বাঁচবে, ঘর প্রায় ধোঁয়াহীন হবে, বন-জঙ্গল ধ্বংসের গতি কমবে, স্লারি দিয়ে মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যাবে,

ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কম হবে। স্লারি দিয়ে কেঁচোসার বানানো যাবে যা পুকুরে মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বায়ু দূষণও অনেকটাই কমে যাবে।

সৌর চুল্লি

জৈব পদার্থ জ্বালিয়ে বা পচিয়ে তার থেকে বেরোনো মিথেন/বায়োগ্যাস জ্বালিয়ে যে শক্তি আমরা পাই, তা কিন্তু সূর্যালোক থেকেই সঞ্চিত শক্তি, সালোক সংশ্লেষ-এর মাধ্যমে এই তাপ সঞ্চিত হয় এবং তাকে জ্বালিয়ে বা পচিয়ে তার থেকে উৎপন্ন তাপই আমরা প্রধানত ব্যবহার করি। কিন্তু বিকিরণ-এর মাধ্যমে সূর্যের যে আলো পৃথিবীতে পৌঁছোয়, তার থেকে সরাসরি তৈরি তাপকে ধরে রেখে তা দিয়েও রান্না করা সম্ভব। একেই আমরা সৌর চুল্লি বলি। এটা দুই ধরনের হয়।

সোলার বক্স বা সৌর বাক্স

এই বাক্সের ভিতর কালো রং করা পাত্রে রান্নার চাল, ডাল, সবজি ইত্যাদি রাখা হয়। ভিতরের বাক্সটি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য ধাতুর তৈরি হয়। বাইরের বাক্স, কাঠ, প্লাস্টিক বা অন্য বস্তু দিয়ে তৈরি হয় যা দিয়ে বিদ্যুৎ যেতে পারে না। ভিতর ও বাইরের বাক্সকে কাঠের গুঁড়ো, থার্মোকলের টুকরো বা ফাইবার গ্লাস দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়, যাতে ভিতরের তাপ সহজে বাইরে না যেতে পারে। বাক্সের উপরের অংশ দুটি মোটা কাচের টুকরো দিয়ে ঢাকা থাকে যাতে বাক্স থেকে বিকিরিত সূর্যালোককে আবার ভিতরে ফেরত পাঠানো যায়।

সূর্যের আলো তির্যকভাবে বাক্সে ঢোকে এবং পাত্রগুলি বাক্সকে গরম করে তোলে। চারদিকে, তাপক্ষয় কম বা রোধ করার

নানা ব্যবস্থা থাকায়, পাত্রগুলি ক্রমশই গরম হয়ে ওঠে ও খাবার সিদ্ধ হওয়ার তাপমাত্রায় পৌঁছায়। এখানে প্রাথমিক মূলধন কিছুটা বেশি হলেও, জ্বালানির কোনও খরচ নেই, ধোঁয়াও হয়না। মেঘলা দিনেও কাজ করে, শুধু বৃষ্টির সময় ছাড়া, তিন চার ঘণ্টায় সব রান্নাই (৩-৪ জনের মতো) হয়ে যায়। খাবার বেশিক্ষণ ধরে বাক্সে থাকলেও, পুড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই।

সোলার বাক্সে তাপকে ধরে রেখে রান্না করা

১০০° সেলসিয়াস, জলের স্ফুটনাঙ্ক

৮৫° সেলসিয়াস, খাদ্য রান্না শুরু হয়

৭৫° সেলসিয়াস, খাদ্য জীবাণুমুক্ত হয়

অন্য একটা নকশায় বানানো (একটু খরচ বেশি-কিন্তু তাড়াতাড়ি রান্না হয়)

একটি অবতল কাচ, ইস্পাত ইত্যাদির প্রতিফলক ব্যবহার করে আলোকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। একে সোলার রিফ্লেক্টর বলা হয়। প্রতিফলিত আলো যেখানে কেন্দ্রীভূত হবে, সেখানে রান্নার পাত্র রাখা হয়। বাসনের বাইরেটা তাপ শোধন করার জন্য, এখানেও কালো রং করা থাকে। আলো পাত্রের সংস্পর্শে এসে তাপে রূপান্তরিত হয় ও তাই দিয়েই রান্না করা হয়। এক্ষেত্রে তাপ ক্রমশই বাড়ে। তাই রান্না শেষ হলে, পাত্র সরিয়ে নিতে হয় এবং সরানোর সময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে হাত বা শরীরের অন্য কোনো অংশ পুড়ে না যায়। কোনও কিছু ভাজা এই দুটোর কোনওটাতেই করা যায়না। কিন্তু একেই প্রকৃত বা চির নূতন শক্তি বলা যায়।

এই আলো ব্যবহার করে সবজি, ফল, মাছ ইত্যাদি শুকানোও সম্ভব। এক্ষেত্রে স্কুলের ডেস্ক-এর মতো একটি বাক্স থাকে, যার চারপাশ কাঠের তক্তা ও নীচেটা স্টিল-এর জাল লাগানো। ওপরে কাচ বা মোটা প্লাস্টিকের ঢাকনা। ঢাকনা ঢালু হওয়ার ফলে বেরিয়ে আসা বাষ্প গড়িয়ে বাইরে পড়ে। সবজি বা ফল, ফুটন্ত জলে বার দুয়েক ডুবিয়ে, ছোট টুকরো করে শুকোতে দেওয়া হয়। বড়ি, পাঁপড়, আমসত্ত্ব ইত্যাদিও এভাবে শুকোনো যায়। গোটা মশলা ইত্যাদি গুঁড়ো করার আগে, শুকিয়ে নিয়ে রাখলে, বেশিদিন থাকে ও ভালো গন্ধ হয়।

দলগতভাবে সবজি, ফল বা মাছ ইত্যাদি শুকোনোর জন্য, একটু বড় বাক্সের প্রয়োজন, যাতে পরপর 'ট্রে' সাজানো থাকে ও বাক্সের নীচের বাতাসকে সূর্যের আলোয় গরম করার ব্যবস্থা থাকে।

সাধারণত সৌর তাপে রান্না করার বাক্স, শুকনো করার বাক্স এইসব দক্ষিণ দিকে মুখ করে রাখা হয়, যাতে বাক্সগুলি বেশিক্ষণ সূর্যের আলো পেতে পারে।

অন্য বিকল্প

যে শক্তিগুলো নিয়ে কাজের কথা বললাম সেগুলি প্রধানত একা বা ছোট দলে করা সম্ভব।

যদি ৩০-৪০ বা তারও বেশি পরিবার হয়, সেক্ষেত্রে আরও নতুন কাজের সুযোগ আছে, যেগুলি চারপাশে বাড়ছে। ধানের তুষ বদ্ধ জায়গায় উচ্চতাপে পুড়িয়ে, সেই গ্যাস থেকে তাপ তৈরি করে, তা দিয়ে

রান্না করা এরকমই একটি। এই ধরনের চুল্লি থেকে যা বেরোয় সেটি ছাই নয়, কাঠকয়লা। এই কাঠকয়লা না পুড়িয়ে যদি মাটিতে মেশানো যায়, তাহলে মাটির উর্বরতা বাড়ে এবং গড়নও ভালো হয়, যার ফলে জল ধরে রাখার ক্ষমতা ও উপকারী জীবাণু, কেঁচোর সংখ্যাও বাড়ে।

ইদানীং স্কুল বা এইরকম অন্য সংস্থায় বেশি লোকের খাবার রান্না করার জন্য এক ধরনের স্টোভ পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলি এই ভাবেই ধানের তুষ, কাঠ বা অন্য জৈব আবর্জনার থেকে গ্যাস বানিয়ে তা দিয়ে রান্নার কাজ করা হয়।

এছাড়াও আর এক ধরনের যন্ত্র বেরিয়েছে, যা কৃষি-আবর্জনা ও মাটি মিশিয়ে উচ্চতাপে গুলের মতো 'পেলেট' তৈরি করে। এই পেলেটকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে বিশেষ ধরনের উনুনের দরকার হয়। এই পেলেট তৈরির যন্ত্র এখনো অতটা চারপাশে ছড়ায়নি।